দুর্বার ভাবনা

ফেব্রুয়ারি ২০১৪

স্বাস্থ্য জগৎ জীবন

দুর্বার ভাবনা

বর্ষ : ৫ সংখ্যা : ১০ ☐ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ... ওষুধ বাজারের নৈরাজ্যে রুখবে কে? ... ১
বিশেষ নিবন্ধ : আম আদমি, রাজনীতি
'আপ আয়ে বাহার আয়ে'... ব্রতীন চট্টোপাধ্যায় ... ৩
বিশেষ নিবন্ধ : রবীন্দ্রোত্তর বিশ্বে সমাজ ও পরিবেশ ৩
রবীন্দ্রনাথের চিন্তাদর্শে সমাজ ও পরিবেশ ... মহম্মদ আনিসুর রহমান ... ৭
আমার স্বদেশ আমার সময়আমার স্বদেশ আমার সময়
আমলা বনাম খনি মাফিয়া ... তরুণ বসু... ১৩
প্রচ্ছদ নিবন্ধ : স্বাস্থ্য জগৎ জীবন
স্বাস্থ্যের পটভূমি... স্মরজিৎ জানা... ১৪
চাই সবার জন্য স্বাস্থ্য ... পুণ্যব্রত গুণ ... ১৯
বিশেষ নিবন্ধ : কি খাচ্ছি কেন খাচ্ছি
চট-জলদি খাবার— 'এবার ফিরাও মোরে' ...বঙ্কিম দত্ত ... ২২
বিশেষ নিবন্ধ : দক্ষিণবঙ্গের হাতি
বিপন্ন ঐরাবত দক্ষিণে সংকট তীব্র ... দেবাশিষ আইচ... ২৪
রিপোর্ট : ড. সমীর বিশ্বাসের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে গণ কনভেনশান ... ২৮
দুর্বার দুর্গোৎসব
ত্র্যম্বকম ... সুধাংশু চক্রবর্তী ... ২৯
দুর্বার মেলা
প্রতিবাদে নারী প্রতিরোধে নারী ...পূজা রায়, রতন দলুই ... ৩০
বিষয় : মাঠ-ময়দানের নাটক
মিস্টার ইন্ডিয়া : একটি হিন্দি নাটক...সৌম্যদীপ্ত মণ্ডল... ৩২

প্রচ্ছদ : তরুণ বসু। ছবির ঋণ স্বীকার : গুগলস ওয়েবসাইট

মুদ্রণ : রে'জ ডট কম, ৪৪/১, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

DURBAR BHABNA
RNI No : **WBMUL/2012/53493**
Vol. 5 No.10 ☐ February 2014.
Editor : Dr Smarajit Jana
Publisher : Bharati Dey
Address : 12/5 Nilmani Mitra Street, Kolkata 700 006
West Bengal, INDIA
Phone : 033 2543 7560/7451 Fax : 033 2543 7777
e mail : sonagachi @sify.com URL : www.durbar.org

সম্পাদকীয়

ওষুধ বাজারের নৈরাজ্যে রুখবে কে?

অনেকেই হয়তো খেয়াল করে থাকবেন সম্প্রতি (২০১৩) কিডনির ক্যান্সারে ব্যবহৃত একটা ওষুধ তৈরি করা নিয়ে এক বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানি এদেশের একটি ওষুধ কোম্পানিকে সুপ্রিম কোর্টের কাঠগড়ায় টেনে এনেছিলেন। ওষুধটির আবিষ্কারক হিসেবে তাদের দাবি ছিল পেটেন্ট আইন মোতাবেক অন্য কোনো কোম্পানি ঐ ওষুধটি তৈরি করতে পারে না। তারা ঐ একই ওষুধ দেশি ওষুধ কোম্পানিটির থেকে ৩০ গুণ বেশি দামে বাজারে বিক্রি করছিলেন এবং স্বভাবতই তা অধিকাংশ মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে ছিল। সুপ্রিম কোর্ট অবশ্য তাদের সে দাবি মেনে দেশি কোম্পানিটির ওপর ওষুধ তৈরির নিষেধাজ্ঞা জারি করেন নি সেটা খুব সুখের কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই যে জনস্বার্থের সপক্ষে আদালত রায় দেবেন এটা বলা যায় না, কারণ ২০০৪ সাল থেকে এদেশে ওষুধ উৎপাদন বিক্রি ইত্যাদির ওপর ভারত সরকার যে নতুন আইন লাগু করেছেন তাতে আবিষ্কারক ওষুধ কোম্পানিকে ত্রিশ বছরের পেটেন্ট দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অর্থাৎ ওষুধ কোম্পানি কোনো নতুন ওষুধ আবিষ্কার করে তার ইচ্ছেমতো দামে কম করেও ত্রিশ বছর ধরে একচেটিয়া ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারবে। ঐ সময়ে অন্য কোনো কোম্পানি ঐ ওষুধটি তৈরি এবং বিক্রি করতে পারবে না তাদের অনুমতি ছাড়া। এই পেটেন্ট আইন নিয়ে বিশ্বজুড়ে নানান বিতর্ক কুট-কাচালি চলছে বছরের পর বছর কিন্তু শেষ পর্যন্ত বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানিগুলি ইউরোপ, আমেরিকার সরকারের পূর্ণ সমর্থন নিয়ে একই ধরণের পেটেন্ট আইন অন্যান্য দেশেও লাগু করতে বাধ্য করেছে। আমাদের দেশের সরকার তাদের চাপের কাছে নতিস্বীকার করে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি উপযোগী ও প্রগতিশীল ওষুধ সংক্রান্ত আইনটি পাল্টাতে বাধ্য হয়েছে। ফলে যে কোনো নতুন ওষুধের দাম এদেশে আকাশছোঁয়া হতে বাধ্য। শুধুমাত্র যে সব ওষুধের পেটেন্টের সময়কাল শেষ হয়ে গেছে সেগুলোর কথা আলাদা। অনেকেই হয়তো বাজারে কিছু ধরণের সস্তাদামে ব্যথা কমানোর বা অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ পেতে পারেন তার কারণ এগুলো বহু আগে আবিষ্কৃত হয়েছে। যেমন ডক্সিসাইক্লিন, পেনিসিলিন, অ্যাসপিরিন, প্যারাসিটামল ইত্যাদি। এইসব ওষুধের হয় কোনোদিন পেটেন্ট হয়নি (যেমন পেনিসিলিন) অথবা পেটেন্ট কাল অতিক্রম করে গেছে। আটআনা, একটাকা দামে ঐসব ওষুধ তাই আজও বাজারে পাওয়া সম্ভব। বলা নিষ্প্রোজন ওষুধের বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করে এই পেটেন্ট আইন। আর ভারত যেহেতু পৃথিবীর অন্যতম ওষুধ উৎপাদক দেশ—

চাই সবার জন্য স্বাস্থ্য

পুণ্যব্রত গুণ

১৯৭৮-এ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে ৬-১২ সেপ্টেম্বর তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের কাজাখ সোভিয়েত সোস্যালিস্ট রিপাবলিকের রাজধানী আলমা আটায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার ওপর এক আন্তর্জাতিক সম্মিলন হয়েছিল। ওই সম্মিলন **২০০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য** লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিল। ঘোষণায় স্বাক্ষরকারী প্রায় দু'শো দেশের মধ্যে আমাদের দেশও ছিল। তখন ভাবা হতো, মাত্র বছর কুড়ি— তারপর তো সবার জন্য স্বাস্থ্য বাস্তব রূপ পাবে।

১৯৮১-তে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তৎকালীন ডিরেক্টর জেনারেল হ্যান্ডেন মাহলার 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' বিষয়টা কি তা বুঝিয়েছিলেন এই ভাবে— "সবার জন্য স্বাস্থ্য মানে একটা দেশের সমস্ত মানুষের নাগালে স্বাস্থ্যকে নিয়ে আসা। আর 'স্বাস্থ্য' মানে ভালো থাকা—কেবল চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়া নয়, এমন এক অবস্থা যাতে একজন মানুষ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবে উৎপাদনক্ষম জীবন যাপন করতে পারেন। সবার জন্য স্বাস্থ্য মানে স্বাস্থ্যের পথে সকল বাধা সরিয়ে ফেলা— অপুষ্টি, অজ্ঞানতা, দূষিত জল, অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান, এছাড়া ডাক্তার, হাসপাতালের শয্যা, ওষুধ ও টিকার অভাবের মতো বিশুদ্ধ ডাক্তারি সমস্যাগুলোরও সমাধান করা।"

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আরও যা যা বলেছিল তা হলো— ১. সবার জন্য স্বাস্থ্য মানে স্বাস্থ্য-কে অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্য হিসেবে গণ্য করা, কেবল অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যম হিসেবে গণ্য করা নয়। ২. সবার জন্য স্বাস্থ্য শেষ পর্যন্ত সবার স্বাক্ষরতা দাবি করে। যতক্ষণ না এমনটা হচ্ছে ততক্ষণ অন্তত প্রত্যেককে বুঝতে হবে স্বাস্থ্য মানে কি! ৩. চিকিৎসা-পরিষেবা ও জনস্বাস্থ্যে লাগাতার উন্নয়নের ওপর 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' নির্ভরশীল। প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার মাধ্যমে সবার কাছে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিতে হবে, যাতে প্রতি গ্রামে বুনিয়াদি চিকিৎসা সহায়তা পাওয়া যায়; সঙ্গে আরও বিশেষজ্ঞ পরিষেবায় পাঠানোর ব্যবস্থা থাকবে। সবাইকে টিকা লাগানোর ব্যবস্থা থাকতে হবে। ৪. 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' আসলে একটা holistic ধারণা যাতে চিকিৎসাবিদ্যা ও জনস্বাস্থ্যের পাশাপাশি কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, বাসস্থান ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় উদ্যোগের প্রয়োজন। কেবল ডাক্তারি পরিষেবা দিয়ে ঝুপড়ি-তে স্বাস্থ্য পৌঁছে দেওয়া যাবে না। এসব মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য এক সম্পূর্ণ নতুন জীবনযাত্রা চাই, নতুন সুযোগ চাই ভালো ভাবে বাঁচার।

১৯৭৮-এর '২০০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' ঘোষণার পর বছরগুলো কেটে যেতে লাগল। কল্যাণকর রাষ্ট্রের ধারণায় মশগুল, তখন আমাদের ধারণা ছিল, স্বাস্থ্য-শিক্ষার মতো পরিষেবা ক্ষেত্রগুলোর দায়িত্ব নেবে সরকার। পশ্চিমবঙ্গে অন্তত সরকারি হাসপাতালের অধিকাংশ বেড ছিল ফ্রি, ফ্রি বেডের রোগীদের বাইরের থেকে ওষুধপত্র-সরঞ্জাম কিনতে হতো না। সরকারি হাসপাতালে, বিশেষত মেডিকেল কলেজগুলোতে যে খামতি ছিল, তা পূরণের জন্য আন্দোলনে নেমেছিল পশ্চিমবঙ্গের জুনিয়ার ডাক্তাররা 'অল বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস্ ফেডরেশন'-এর পতাকা তলে ১৯৮৩ ও ৮৬ সালে। কিছুটা হলেও অবস্থার উন্নতি হয়েছিল। ১৯৯০-এর দশকে অর্থনীতির উদারীকরণ, কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস— বিশ্ব ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের শর্ত মেনে পরিষেবা ক্ষেত্র থেকে সরে আসতে শুরু করল সরকার। সরকারি হাসপাতালে ইউজা-র ফি শুরু হলো— ডাক্তার দেখাতে টাকা, পরীক্ষা করাতে টাকা, অপারেশন করতে টাকা। সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে লাগল আর সরকারি মদতে ব্যবসায়ীরা স্বাস্থ্য ব্যবসা করতে লাগল অবাধে।

আজ কোথায় ভারতবাসীর স্বাস্থ্য?

এ-দেশে গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য-সূচকগুলো এইরকম:

১. এক মাসের নীচে শিশু মৃত্যুর হার, জন্মানো প্রতি ১০০০ জীবিত শিশুর মধ্যে ৩২ (২০১০-এর তথ্য), দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ভারত ষষ্ঠ স্থানে, আরও খারাপ কেবল পাকিস্তান ও আফগানিস্থান।

২. এক বছরের নীচে শিশু মৃত্যুর হার, জন্মানো প্রতি ১০০০ জীবিত শিশুর মধ্যে ৪৮ (২০১০-এর তথ্য), দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ভারত ষষ্ঠ স্থানে, আরও খারাপ পাকিস্তান ও আফগানিস্থান।

৩. প্রাপ্তবয়স্কদের মৃত্যুর হার ২১২ (২০০৯), দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ভারত চতুর্থ স্থানে।

৪. জন্মের সময় সম্ভাব্য আয়ু ৬৫ বছর (২০০৯), দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ভারত চতুর্থ স্থানে।

৫.পানীয় জল পান ৮৮ শতাংশ মানুষ (২০০৯), দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ভারত সপ্তম স্থানে।

৬. শৌচাগারের সুবিধা আছে ৩১ শতাংশের (২০০৮), দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ভারত সপ্তম স্থানে, নেপালের সঙ্গে সবচেয়ে খারাপ স্থানে।

৭. চিকিৎসক ৬.৪৯ জন প্রতি ১০ হাজারে, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ভারত তৃতীয় স্থানে।

৮. নার্স ও দাই, ৯.৯৬ জন প্রতি ১০ হাজারে। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ভারত পঞ্চম স্থানে।

৯. জিডিপি-র ৪.২ শতাংশ স্বাস্থ্যখাতে মোট খরচ (২০১০), দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ভারত পঞ্চম স্থানে।

১০. স্বাস্থ্যখাতে মোটখরচের ২৯.২ শতাংশ সরকারি ব্যয় (২০১০), দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ভারত সপ্তম স্থানে, ভারতের চেয়ে খারাপ কেবল আফগানিস্থান।

১১. স্বাস্থ্যখাতে মোট খরচের ৭০.৮ শতাংশ বেসরকারি খরচ (২০১০), দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ভারত দ্বিতীয় স্থানে, ভারতের চেয়েও খারাপ আফগানিস্থান।

১২. স্বাস্থ্যখাতে বেসরকারি খরচের ৮৬.৪ শতাংশ

রোগীর পকেটে থেকে যায় (২০১০), দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ভারত চতুর্থ স্থানে।

বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার নথিতে আমদের দেশ ও অঞ্চল ও সমগ্র পৃথিবীর তুলনায় কোথায় দাঁড়িয়ে

	ভারত	অঞ্চল	পৃথিবী
শহরে বাস করে জনসংখ্যার শতাংশ	৩১	৩৪	৫২
জন্মের সময় সম্ভাব্য আয়ু (বছরে)	৬৫	৬৭	৭০
৫ বছরের নীচে শিশুমৃত্যুর হার (প্রতি হাজার জীবিত শিশু জন্মে)	৬১	৫৫	৫১
মাতৃমৃত্যুর অনুপাত (প্রতি ১ লক্ষ জীবিত শিশু জন্মে)	২০০	২০০	২১০
যক্ষ্মারোগের প্রাদুর্ভাব (প্রতি ১লক্ষ জনসংখ্যায়)	২৪৯	২৭১	১৭০
ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব (প্রতি ১লক্ষ জনসংখ্যায়)	১৯৭৩	১৭৭৩	৪০৮২

২০০০ সালে সবার জন্য স্বাস্থ্য-র লক্ষ্যে পৌঁছোনো যায় নি। এখনও ভোটে জিতে ক্ষমতায় আসে সংসদীয় রাজনৈতিক দলগুলো। তাই জনগণের স্বাস্থ্যের কথা তাদের অন্তত মুখে বলতে হয়। সে কারণেই বোধ হয় দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আগে ২০১০-এর অক্টোবরে যোজনা কমিশন এক উচ্চস্তরীয় বিশেষজ্ঞ দল গঠন করে সবার জন্য স্বাস্থ্য-পরিষেবা বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ দিতে। দলের প্রধান ছিলেন পাব্লিক হেলথ ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া-র ডা. শ্রীনাথ রেড্ডি। বিশেষজ্ঞ দল রিপোর্ট পেশ করে ২০১১-র নভেম্বরে। বিশাল এক রিপোর্টে এই সুপারিশ পেশ করা হয়। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো এরকম : **এক**, বিশেষজ্ঞ দল বলে স্বাস্থ্যখাতে সরকারি ব্যয় জিডিপি-র ১.৪ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে দ্বাদশ পরিকল্পনার শেষে অন্তত ২.৫ শতাংশ এবং ২০২২-র মধ্যে অন্তত ৩ শতাংশ করা হোক। **দুই**, বিশেষজ্ঞ দল বলে ওষুধ কেনায় সরকারী ব্যয় জিডিপি-র ০.৫ শতাংশ বাড়ালেই সবার জন্য বিনামূল্যে অত্যাবশ্যক ওষুধ দেওয়া যায়। তেমনটা নিশ্চিত করা হোক। **তিন**, প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের এক National Health Entitlement Card থাকবে যা দেখিয়ে দেশের যে কোনো প্রান্তে বিনামূল্যে প্রাথমিক, মধ্যম স্তরের ও উচ্চ স্তরের স্বাস্থ্য-পরিষেবা পাওয়া যাবে। কি পরিষেবা পাওয়া যাবে সেগুলো ঘোষিত থাকবে ন্যাশনাল হেলথ প্যাকেজে। **চার**, সমস্ত পরিষেবা সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। যেখানে সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে কোনো পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে না, সেখানে সেই পরিষেবা কেন্দ্র বা রাজ্যসরকার তাদের স্বাস্থ্য দপ্তর বা এই কাজের জন্য স্থাপিত আধা-সরকারি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার মারফত কিনবে, রোগীকে পরিষেবা কিনতে হবে না। **পাঁচ**, ইএসআই, রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনার মতো সরকারি পয়সায় চলা সমস্ত বিমা-প্রকল্পকে কালক্রমে সর্বজনীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। সব সরকারি স্বাস্থ্যবিমা কার্ডের বদলে থাকবে National Health Entitlement Cards. শ্রমমন্ত্রক রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা-র জন্য পয়সায় চলা সমস্ত বিমা-যোজনার জন্য যে পরি-কাঠামো গড়ে তুলেছে, তা হবে সর্বজনীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কর্মকাণ্ডের মেরুদণ্ড। এই পরিকাঠামোকে স্বাস্থ্য ও পরিকল্পনা দপ্তরের অধীনে আনা হোক। **ছয়**, চিকিৎসা ব্যবস্থাকে নতুন দিশাদেওয়া হোক যাতে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবায় জোর দেওয়া হবে। **সাত**, জেনারেল হাসপাতালগুলোকে মজবুত করা হোক। **আট**, বিভিন্ন স্তরে পর্যাপ্ত সংখ্যায় প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মী ও স্বাস্থ্য কারিগরিবিদ নিশ্চিত করতে হবে। ক. জোর দিতেহবে প্রাথমিক স্তরে। খ. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নর্ম অনুযায়ী স্বাস্থ্যের জন্য মানব সম্পদের (ডাক্তার, নার্স, দাই) ঘনত্ব বাড়াতে হবে। **নয়**, জেলা স্বাস্থ্য জ্ঞান কেন্দ্র স্থাপন করা হোক। **দশ**, বর্তমান গ্রাম স্বাস্থ্য সমিতি বা স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন সমিতিগুলোকে হেলথ কাউন্সিলে রূপান্তরিত করা হোক, যাতে গ্রামবাসীর সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকবে। **এগারো**, ওষুধের যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার নিশ্চিত করা হোক। **বারো**, জাতীয় ও রাজ্য ওষুধ সরবরাহ লজিস্টিক কর্পোরেশন স্থাপন করা হোক। **তেরো**, ওষুধ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে মজবুত করতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রককে ক্ষমতা দেওয়া হোক। **চোদ্দ**, সর্বভারতীয় এবং রাজ্য-স্তরের পাব্লিক হেলথ সার্ভিস ক্যাডার এবং রাজ্যস্তরে বিশেষ হেলথ সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট ক্যাডার স্থাপন করা হোক যাতে জনস্বাস্থ্য বেশি গুরুত্ব পায় এবং সর্বজনীন স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার পরিচালনা মজবুত হয়। **পনেরো**, জাতীয় স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রক এবং উন্নয়ন অধিকরণ (National Health Regulatory and Development Authority) স্থাপন করা হোক। **ষোলো**, জাতীয় ওষুধ নিয়ন্ত্রক অধিকরণ স্থাপন করা হোক যার প্রধান উদ্দেশ্য হবে : ওষুধ ও ডাক্তারি যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রণ করা এবং তাকে নিরাপদে ও সুলভে রোগীর নাগালে পৌঁছোনো।

এই কমিটির সুপারিশের দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলাদা করে বলা দরকার। এক, কমিটি রোগীদের কাছ থেকে ইউজার ফি নেওয়ার বিরোধিতা করেছে; দুই, স্বাস্থ্য-ক্ষেত্রে বিমার বিরুদ্ধে এরা।

কিন্তু এই বিশাল পরিষেবার খরচ কোথা থেকে আসবে? বিশেষজ্ঞ দল হিসেবে করে দেখিয়েছেন— চিকিৎসা পরিষেবার অর্থের মূল উৎস হবে সাধারণ কর, সঙ্গে যাঁরা মাইনে পান বা আয়কর দেন তাঁদের মাইনে বা করযোগ্য আয়ের অনুপাত হিসেবে অতিরিক্ত বাধ্যতামূলক অর্থ।

শ্রীনাথ রেড্ডি কমিটি-র সুপারিশ দেখে আমরা আনন্দিত হয়েছিলাম— এবার বুঝি দেশের সব মানুষের নাগালে স্বাস্থ্য পরিষেবা আসতে চলেছে। কিন্তু হতাশ করল দ্বাদশ পরিকল্পনা।

জিডিপি-র ২.৫ শতাংশ নয়, স্বাস্থ্যখাতে সরকারি ব্যয়বরাদ্দ বাড়িয়ে করা হলো ১.৫৮ শতাংশ। বলা হলো, কেন্দ্রীয় বরাদ্দ হবে, রাজ্য নিজে স্বাস্থ্যখাতে যা ব্যয় করে তার চেয়ে কিছু বেশি। কেন্দ্র কর বাবদ রাজ্য থেকে যে অর্থ নেয়, ফেরত দেয় তার ১৫-২০ শতাংশ। বেশির ভাগ রাজ্য স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বাড়াতে পারবে না। জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন, জননী সুরক্ষা যোজনা, পরিবার পরিকল্পনা, টিকাদান, যক্ষ্মা-ম্যালেরিয়া-ডায়েরিয়া প্রতিরোধ, ইত্যাদি সবই এখন চলে কেন্দ্রের অর্থে। রাজ্যে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দের অর্ধেক যদি কেন্দ্র দেয়, তবে ব্যয় বরাদ্দ বাড়া তো দূরের কথা, কমে যাবে। বলা হয়েছে, সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবায় নিজের কেন্দ্রীয় ভূমিকা ত্যাগ করে মূলত ম্যানেজার হিসেবে কাজ করবে। বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা ও স্বাস্থ্যবিমার ভূমিকা হবে প্রধান। এ বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোর ম্যানেজড হেলথ কেয়ার-এর উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।

উচ্চ-স্তরীয় বিশেষজ্ঞ দল-এর সুপারিশ করা হেলথ প্যাকেজ ও প্রয়োজনে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তির বদলে সরকারের পয়সায় বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতি করার কথা বলা হয়েছে। লাভজনক তৃতীয় স্তরের পরিষেবাকে তুলে দেওয়া হবে কর্পোরেট হাসপাতালের হাতে। সরকারি অনুদানে বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবসায়ীরা ও অ-সরকারি সংস্থাগুলো নতুন চিকিৎসা পরিকাঠামো গড়ে তুলবে। যেটুকু সরকারি ব্যবস্থা আছে,

সেটুকুও গুটিয়ে ফেলা হবে। প্রতি পরিবার নিজের পছন্দমতো বেসরকারি হাসপাতাল বেছে নেবেন, সরকার একটা সীমা অবধি তার মূল্য চুকিয়ে দেবে। আর জাতীয় স্বাস্থ্য প্যাকেজের উল্লেখ অবধি নেই এই দ্বাদশ পরিকল্পনায়। চিকিৎসকের অভাব মেটানোর জন্য প্রাইভেট হাসপাতাল ও মেডিকাল কলেজে গড়ে তোলার জন্য সরকার উৎসাহ দিতে মোট খরচের ২০ শতাংশ অবধি অনুদান দেবে। তাদের আয় বাড়ানোর জন্য কর ছাড় দেওয়া হবে। সরকারি অর্থে গড়ে তোলা বেসরকারি হাসপাতালে ইউজার ফি সবই নেওয়া যাবে। পরিকল্পনায় উল্লেখ নেই— জেনেরিক নামের ওষুধ প্রচলনের, বিনা পয়সায় অত্যাবশ্যক ওষুধ সরবরাহের, ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণের।

তাহলে কি সবার জন্য স্বাস্থ্য এক অলীক কল্পনা?

সবচেয়ে প্রথম যে ছোটো দেশটি তার সমস্ত নাগরিকের স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্ব নেয় সে হলো নরওয়ে, ১৯১২ সালে। তারপর সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৩৭ সালে সবার জন্য স্বাস্থ্য কার্যকর করে, ১৯৬৯ থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের গ্রামাঞ্চলের মানুষও শহরাঞ্চলের মানুষের সমান সুবিধা পেতে থাকেন। ১৯৩৩-এ দুই বিদেশি জনস্বাস্থ্যবিদ ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের স্যার আর্থার নিউসহোম ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন অ্যাডামস কিলবারি সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে যান। তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা তাঁরা লেখেন *Red Medicine : Socialized Health in Soviet Russia* গ্রন্থে। গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁরা বলেন—'একজন রাশিয়ান অসুস্থ হলে সরকার তার জন্য কিছু করে। বাস্তবে সরকার ইতিমধ্যেই করে রেখেছে। সোভিয়েত রাশিয়া সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ব্যক্তি মানুষের স্বাস্থ্য সমাগ্রিক ভাবে সমাজেরই দায়িত্ব। বাস্তবে সোভিয়েত ইউনিয়ন পৃথিবীর একমাত্র দেশ যা তার সীমায় বসবাসকারী সমস্ত পুরুষ, মহিলা ও শিশুর রোগ-প্রতিরোধ ও রোগ চিকিৎসার জন্য এক পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা গঠন ও পরিচালনা করছে।'

১৯৪৯-এ চিন শোষণমুক্ত হয়। ১৯৫০ সালের আগস্টে গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের প্রথম জাতীয় স্বাস্থ্য কংগ্রেসে চারটে মূল নীতি স্থির করা হয় : এক, সমস্ত শ্রমিক, কৃষক ও সৈন্যের জন্য চিকিৎসা-ব্যবস্থা; দুই, রোগ-চিকিৎসার চেয়ে রোগ-প্রতিরোধে বেশি গুরুত্ব দান; তিন, পাশ্চাত্য চিকিৎসা-পদ্ধতির সাথে প্রাচীন চিনা পদ্ধতির সমন্বয় সাধন; চার স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত কাজকর্মকে গণ-আন্দোলনের সাথে যুক্ত করা। এছাড়াও তাঁদের আরও দু'টি ঘোষিত নীতি ছিল: ১. গ্রামাঞ্চলের ওপর জোর দাও (Put Emphasis on Rural Areas), ২. রাজনীতিকে নিয়ন্তা কর (Put Politics in Command)। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় সমবায় ভিত্তিক স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা পরিষেবার (Co-operative Medical Care System) মাধ্যমে সবার জন্য পৌঁছে দেওয়া হতে থাকে।

১৯৬০-এ কিউবা শোষণ-মুক্ত হয়। ১৯৬০-এ বিপ্লবী, চিকিৎসক ও কিউবার মন্ত্রী চে গেভারা *On Revolutionary Medicine*-এ বলেন— 'স্বাস্থ্য মন্ত্রক ও সমধর্মী সংস্থাগুলোর আজকের কাজ হলো যত বেশি সংখ্যক সম্ভব মানুষের কাছে জনস্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া; রোগ-প্রতিরোধ কর্মসূচি শুরু করা, জনসাধারণকে স্বাস্থ্যকর অভ্যাসে শিক্ষিত করা।' কিউবা-র সংশোধিত সংবিধান-এর ৫০ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়— 'প্রত্যেকের স্বাস্থ্য-রক্ষা ও চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার আছে। এই অধিকারকে নিশ্চিত করতে সরকার গ্রামীণ মেডিকেল সার্ভিস নেটওয়ার্ক, পলিক্লিনিক, হাসপাতাল, রোগ-প্রতিরোধ ও বিশেষজ্ঞ রোগ চিকিৎসাকেন্দ্রের মাধ্যমে বিনামূল্যে চিকিৎসা দেয় ও হাসপাতালে ভর্তি থেকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে, বিনামূল্যে দাঁতের চিকিৎসা দেয়, স্বাস্থ্যপ্রচার ও স্বাস্থ্যশিক্ষা অভিযান চালায়, নিয়মিত স্বাস্থ্যপরীক্ষার ব্যবস্থা করে, রোগের মড়ক ঠেকাতে সাধারণ টিকাকরণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়। এই কর্মকাণ্ডে জনসাধারণ অংশ নেয় এবং সামাজিক ও গণসংগঠনগুলোর মাধ্যমে পরিকল্পনা করে।'

সবার জন্য স্বাস্থ্য কি কেবল সমাজতন্ত্রেই সম্ভব?

তা নয়। সর্বজনীন স্বাস্থ্যের পথে চলা দেশগুলো এইরকম : ১৯৩৮ নিউজিল্যান্ড ও জাপান; ১৯৪১ জার্মানি; ১৯৪৫ বেলজিয়াম; ১৯৪৮ ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য।

১৯৪৮-এর ৫ জুলাই ব্রিটেনের তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী এনিউরিন বিভান ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস (এনএইচএস) স্থাপন করেন তিনটে মূল নীতির ভিত্তিতে : এক, এটি সবার প্রয়োজন মেটাবে। দুই, পরিষেবা দেওয়া হবে বিনামূল্যে। রোগীর প্রয়োজনের ওপর ভিত্তি করে তার অর্থ-প্রদানের ক্ষমতার ওপরে নয়। এনএইচএস পরিচালনার ৭টা নীতি একরকম : ১.এনএইচএস সবার জন্য পূর্ণাঙ্গ পরিষেবা দেয়। ২.এনএইচএস পরিষেবা ব্যক্তির অর্থপ্রদানের ক্ষমতার ওপর নয়, তাঁর চিকৎসার প্রয়োজনের ওপর গুরুত্ব দেয়। ৩. এনএইচএস-এর লক্ষ্য উৎকর্ষ ও পেশাদারিত্বের সর্বোচ্চ মানে পৌঁছোনো। ৪. এনএইচএস-এর সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে থাকেন রোগীরা। ৫. রোগী, স্থানীয় জনসমুদায় ও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থে এনএইচএস সাংগঠনিক সীমা অতিক্রম করে ও অন্যান্য সংগঠনগুলোর সঙ্গে অংশীদারিত্বে কাজ করে। ৬. করদাতাদের অর্থের সর্বোচ্চ মূল্য দিতে ও সীমাবদ্ধ সাধনের সবচেয়ে কার্যকর, স্বচ্ছ ও দীর্ঘস্থায়ী ব্যবহার করতে এনএইচএস দায়বদ্ধ। ৭. এনএইচএস-এর দায়বদ্ধতা জনসাধারণ, সমাজ ও রোগীদের প্রতি। এনএইচএস যে সব মূল্যবোধ নিয়ে কাজ করে : এক সাথে রোগীর জন্য কাজ করা; শ্রদ্ধা ও মর্যাদা; চিকিৎসার মানের প্রতি দায়বদ্ধতা; সহমর্মিতা; জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন;প্রত্যেকেই গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৫০ কুয়েত ও চিন; ১৯৫৫ সুইডেন; ১৯৫৭ বাহরিন; ১৯৫৮ ব্রুনেই; ১৯৬০ কিউবা; ১৯৬৬ কানাডা ও নেদারল্যান্ডস; ১৯৬৭ অস্ট্রিয়া; ১৯৭১ সংযুক্ত আরব আমিরশাহী; ১৯৭২ ফিনল্যান্ড ও স্লোভেনিয়া; ১৯৭৩ ডেনমার্ক ও লুক্সেমবার্গ; ১৯৭৪ ফ্রান্স; ১৯৭৫ অস্ট্রেলিয়া; ১৯৭৭ আয়ারল্যান্ড; ১৯৭৮ ইতালি; ১৯৭৯ পর্তুগাল; ১৯৮০ সাইপ্রাস; ১৯৮৩ গ্রিস; ১৯৮৬ স্পেন; ১৯৮৮ দক্ষিণ কোরিয়া; ১৯৯০ আইসল্যান্ড; ১৯৯৩ হংকং ও সিঙ্গাপুর; ১৯৯৪ সুইজারল্যান্ড; ১৯৯৫ ইজরায়েল ও তাইওয়ান; ২০০০ শ্রী লংকা; ২০০১ থাইল্যান্ড; ২০০৯ পেরু।

এসব দেশে সবার জন্য স্বাস্থ্য-পরিষেবার অর্থ আসে কোথা থেকে? অধিকাংশ দেশেই সাধারণ কর হলো অর্থের প্রধান উৎস। অনেক দেশে আবার এর পরিপূরক হিসাবে নির্দিষ্ট লেভি সংগ্রহ করা হয়, কখনও ব্যক্তি মানুষের কাছ থেকে কখনও বা নিয়োগকর্তার কাছ থেকে। এই সব দেশে যদি সবার জন্য স্বাস্থ্য বাস্তবায়িত হতে পারে, তাহলে আমাদের দেশে নয় কেন?

আসুন, আমরা সবার জন্য স্বাস্থ্য-র দাবিতে আবার মুখরিত হই, শ্রীনাথ রেড্ডি কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের দাবি তুলি। সরকার পুলিশ-মিলিটারি খাতে ব্যয় কমিয়ে স্বাস্থ্য-শিক্ষা খাতে ব্যয় বাড়াক।□